OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 166 - 173
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রাজশেখর বসুর নির্বাচিত গল্পে পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গির বিনির্মাণ

দীপ্তি সাহা
অতিথি অধ্যাপিকা
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID: dipti.saha00@gmail.com
0009-0005-4688-7414

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Mythology, Puranas, Rewriting, Reviving, Reconstruction, Modern era, Literature, Short stories.

Abstract

The influence of mythology or the emergence of new mythology in modern Bengali literature is noteworthy issue. Mythology is the root of today's literary tree, without which the foundation of literature cannot be imagined. We observe the influence of our mythology in various works of poets and writers from the middle-ages to modern era. The work of re-creating Puranas in Bengali literature began with the help of the famous writer Madhusudan Dutta, and one of the prominent writers on that path was Rajsekhar Bose. He is known as Puranic character named 'Parshuram'. Since his father Candrasekhar Bose was great scholar, it is natural that Puranic stories are widely used in his works. Although 18 Puranas and many Uppuranas exist as cultural heritage, in the modern era we find the historical sources of these Puranas from our oldest epics, the 'Ramayana' and the 'Mahabharata'. Therefore, the writers of Bengali literature have achieved immense prosperity by rewriting, reviving and rearranging these mythological stories. In the modern era, the concept of mythology has changed. Short stories are one of the genres of modern literature. In today's busy life, people want to satisfy their taste for mythology through short stories. As a result, some writers like Rajsekhar have done this very skillfully and have reconstructed the mythology in new way by adding their own talent. His stories generally emphasize humor and satire, but his extensive use of mythology as a means of achieving that satire is truly unparalleled. Through some of his stories, themes or characters of mythology are combined with Kalpapurana and transformed into new forms, giving the stories a new dimension. I will try to show that the stories have gained a new perspective and reconstruction he has portrayed on the mythological subjects or characters.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে ভারতীয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও শাস্ত্র। এই বেদ পুরাণেই বর্ণিত রয়েছে প্রাচীন জনজীবনের অসংখ্য ইতিহাস ও আখ্যান। আজকের যন্ত্র সভ্যতার যুগে বেদ পুরাণ নিয়ে কেউই ততটা ভাবিত নয়, কিন্তু মানব জীবনের প্রকৃত শিকড় এই পৌরাণিক শাস্ত্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত এমন কিছু কাহিনি যেখানে কোনো জাতির বিশ্বাস, ধারণা ও নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বর্ণনা থাকে তাকেই আমরা পুরাণ বলতে পারি। পুরাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রাচীন কথা'। আমরা যখন থেকে মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষায় ব্যক্ত করতে শিখেছি তখন থেকেই গড়ে উঠেছে নানা ধরনের আখ্যান। আখ্যান অর্থে 'ঘটনা সমবায়'-এর বর্ণনা।

> "যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টি-বিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার বর্ণন, অন্ততত্ত্ব নির্ণয় জ্যতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজন্যবর্গের বংশাবলী প্রভৃতি নানা বিষয়ে সবিশেষ লিখিত আছে, এবং যদ্দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থার পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নির্মলতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য জন্মে, তার নাম পুরাণ।"[১]

প্রত্যেক জাতির সৃষ্টির পেছেনে কিছু সংস্কৃতি থাকে, তাদের উদ্ভবকালে কিছু পূর্ব আখ্যান থাকে। সেগুলোকে মানুষের অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে মেনে নিয়ে ক্রমে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে পুরাণ সাহিত্যের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে এই ধারণা ছিল যে প্রাকৃতিক শক্তির রহস্যময়তার অন্তরালে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। পরিমিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পায়নি তখনই দৈবশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। যাইহোক –

> "এই আখ্যানগুলিকেই আমরা পুরাণ বা পুরা কথা বা প্রাচীন কথা বলে থাকি। ইংরাজিতে পুরাণকে সাধারণত মিথ বা মাইথলজি (Mythology) বলা হয়।"[২]

পুরাণের অস্তিত্বের খোঁজ করলে দেখা যায় –

> "পুরাণের কোনো কোনো অংশ অতি প্রাচীন, হয়তো বেদেরও সমকালীন, কিন্তু তা বর্তমান আকারে সংকলিত হয়েছে মাত্র দেড় হাজার বছর আগে।"[৩]

সুতরাং পুরাণ হচ্ছে –

> "বেদমূলক উত্তরবৈদিক সাহিত্য গ্রন্থ। বেদের শিক্ষাকে আখ্যান ও রূপকের সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে মনোরম করে জনসমাজে প্রচার করা। যার ফলে এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যই সবচেয়ে বেশি। তাই পুরাণের ওপর নাম পঞ্চমবেদ।"[৪]

আসলে আমরা যাকে পুরাণ বলে মনে করি, তার উপকরণগত ব্যাপ্তি মিথের চেয়ে অনেক বেশি এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যে বইগুলি পুরাণ বলে গণ্য তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতীতি, ইউরোপীয় অর্থের মিথ। কিংবদন্তী এবং বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ একত্রিত হয়ে থাকে।

> "আমাদের যা পুরাণ, তার মধ্যে মিথ, ইতিহাস কিংবদন্তী এবং লোককথা এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে যে, বহুক্ষেত্রেই পুরদস্তুর ভাবে মিথ বলা যায়, তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব না।"[৫]

বৈদিক সাহিত্য অনুযায়ী পুরাণ ও ইতিহাস সমর্থক। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ধারনা পরিবর্তন হয়েছে। ইতিহাস আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক কিছু একই সঙ্গে সমন্বিত হয়ে যে মিশ্ররূপসম্পন্ন গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে সেগুলোকেই পুরাণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে সে কথা জনশ্রুতিমূলক চির-প্রচলিত পুরাতন কথা হলেও ইতিহাস বলা চলে না। কিন্তু সাধারণ অর্থে পুরাণ বলতে বোঝায় ব্যাসাদি মুনি রচিত শাস্ত্র যা সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণে বিশেষিত।[৬]

> "পুরাণ সম্পর্কে অথর্ব বেদ, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, বৈত্তিরীয়, আরণ্যক, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে, কয়েকটি গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে এবং বিশেষত মহাভারতে অনেক ব্যখ্যান করা হয়েছে। আর সেই অনুসারে ১৮টি মহাপুরাণ এবং অজস্র উপপুরাণ রচিত হয়েছে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু এই পুরাণ গ্রন্থগুলো ধর্মবিদ পণ্ডিত সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষের জন্য গৃহীত হয়নি। বরং প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ মানুষ এবং সাহিত্যস্রষ্টাদের কাছে ওই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিই পুরাণের আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে এসেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐতিহ্যে পুরাণ কথাটির নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় তাৎপর্য থাকলেও আধুনিক কালে রামায়ন ও মহাভারতের বিভিন্ন পাঠে সংকলিত কাহিনিগুলিকেই পৌরাণিক গল্প বলে গণ্য করা হয়। পুরাণের বেশিরভাগ ঐতিহ্যকে এই দুই মহাকাব্য ধারণ করে রেখেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য কাহিনিগুলি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে মানুষের মনের গভীরে শিকড় অনুপ্রবিষ্ট করে রেখেছে বহুদূর পর্যন্ত। ফলে আধুনিক কালের লেখকরাও যখন এই দুই মহাকাব্যের অন্তর্গত পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে নতুনভাবে রচনা করেছেন, তাঁরাও সেই শিকড়ের বন্ধনটা অতিক্রম করতে পারেননি। তাই এইসব মিথ কাহিনিগুলোকে আধুনিক মানসিকতায় নিষিক্ত করে গড়ে তুলেছেন।

আমাদের পুরাণ কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্ম ভাবনা এখনও একান্তই সজীব, তাই প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত আমাদের বাংলা সাহিত্যে পুরাণের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। পুরাণ অনুষঙ্গকে সাহিত্যকরা নিজের মতো করে রূপদানের প্রয়াস সব যুগেই করেছেন। উনিশ শতকে এই ধারা লুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে প্লাবিত হয়ে উঠেছে। কোথাও পুরাণ কথা, কাহিনি ও পৌরাণিক চরিত্রকে নিয়ে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে একই পুরাণ কাহিনিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়ে, কোথাও মৌলিক কল্পনা মিশিয়ে নবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের আখ্যান কাব্য এর স্পষ্ট প্রমান। রবীন্দ্রনাথ রচিত বিভিন্ন কাব্য ও নাটকেও তার বহু প্রমান রয়েছে। পুরাণ অনুষঙ্গের পুনঃপ্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে তাই আর নতুন কথা নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই পুরাণ প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তাশৈলী কিছু আলাদা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখদের কথা উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের পুরাণ অনুষঙ্গবাহী কাব্যগুলিতে যে ধর্ম বিশ্বাস ও দেবদেবীর প্রতি আস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল, ক্রমে আধুনিক যুগে সেই মানসিকতা পরিবর্তন হতে লাগল। আধুনিক যুগের এই বাস্তব মানসিকতায় প্রাতীচ্যের প্রাচীন মিথের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ বর্জন হতে শুরু করল। ফলে পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রতি আস্থাও হ্রাস পেতে থাকল। এর ফলে আজকের বাস্তবতার সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলির বিরাট বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল। সাহিত্যকেরা সেই ব্যবধানটিকে নিজেদের মতো করে কেও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার, কেও হাস্য-কৌতুকের আবার কেও সত্য উপলব্ধির উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলেন। জীবনের প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টায় তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুরাণের নব রূপায়ণ ঘটালেন।

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অনুবাদক, রাসায়নবিদ ও অভিধান প্রণেতা। তিনি ‘পরশুরাম’ ছদ্মনামে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রুপাত্মক কথা সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে মাসিক পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। এর মাধ্যমেই পুরাণ সম্পর্কে তাঁর মুখ্য প্রবণতাটির ইঙ্গিত মেলে। ‘পরশুরাম’ পুরাণের একজন বিশিষ্ট চরিত্র।

“বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং জমদাগ্নি ও রেনুকার পঞ্চম পুত্র।”[৮]

তিনি যেভাবে মাতার দ্বিচারিতার জন্য পিতার আজ্ঞা পালনে মাতৃহত্যা পর্যন্ত করেছিলেন এবং ন্যায়ের জন্য অসৎ ক্ষত্রিয়দের দমনে রত হয়েছিলেন, একইরকম ভাবে রাজশেখর বসু তাঁর কলমের অস্ত্র দিয়ে অন্যায়কে দমন করে সাহিত্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে হাস্য কৌতুকের ঢাল এবং পুরাণ অনুষঙ্গের অসি তাঁকে অনেকটা সাহায্য করেছে।

তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। পুরাণের উপর তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল কারণ পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এছাড়া তিনি নিজে রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, গীতার সফল অনুবাদক, সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবে তাঁর রচনায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে। এই ধরনের পুরাণ চর্চার ফলে তিনি পুরাণের মর্মস্থলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তাই অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুরাণের রূপরস অনাহত রেখে পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাকে অবলম্বন করে একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনি লিখেছেন। তাঁর রচিত গল্পগুলোর মধ্যে সাধারণত হাস্য কৌতুক, রঙ্গ-ব্যঙ্গকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের কৌশল হিসাবে পুরাণের যে ব্যপক ব্যবহার করেছেন তা সত্যি অতুলনীয়। তাঁর অপার গল্পসংগ্রহের মধ্যে ৩০টির বেশি গল্প পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত। তবে সীমিত পরিসরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্য এখানে আমরা 'যযাতির জরা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'জাবালি', 'ভীমগীতা', 'রেবতীর পতিলাভ', 'নির্মোক নৃত্য' - এই ৭টি গল্পের বিশ্লেষণ করবো।

চারটি বেদের প্রথম বেদ ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে বালখিল্য মুনিদের কথা।

"ঋগ্বেদের উল্লেখ অনুসারে এরা ব্রহ্মার লোম হতে উদ্ভূত মানসপুত্র।"[৯]

এই মুনিরা বুড়ো আঙুলের সমান হন এবং এদের সংখ্যা ষাট হাজার। পরশুরাম এই অদ্ভুত ধরনের মুনিদের নিয়ে তাঁর 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্প রচনা করেছেন। প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বালখিল্য মুনিদের মাতৃগর্ভ থেকে এক বিরোধীতা শুরু হয় এই গল্পে। ঋষি বিশ্বমিত্রের আদেশে মাতৃদুগ্ধ বা গব্যাদির দুগ্ধ তাঁদের জীর্ণ হবে না বলে শেষে ঝুলন্ত বাদুরের দুগ্ধ পান করিয়ে তাঁদের শান্ত করতে হয়। পুরাণে রয়েছে তাঁদের খর্বাকৃতির জন্য একবার তাঁরা ইন্দ্রের কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল, ফলে তাঁরা নিজেদের বীর প্রমান করতে ব্রহ্মার কাছে আর এক ইন্দ্রের আবেদন জানান, কিন্তু তা সম্ভব না দেখে তিনি অরুণ ও গরুড় দুই পক্ষীশ্রেষ্ঠর সৃষ্টি করেন। গরুড়কে দিয়ে গজকচ্ছপের ভক্ষণ করিয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। এরপর এক বটবৃক্ষের শাখায় স্থান গ্রহণ করতেই তা ভগ্ন হয়, বালখিল্য মুনিরা সেই বৃক্ষে অধোমুখে তপস্যারত অবস্থায় ছিলেন, গরুড় চঞ্চুপুটে উক্ত শাখা ধারণপূর্বক তাঁদের নিয়ে ঋষি কশ্যপের আদেশ অনুযায়ী হিমালয়ে যান। লেখক পৌরাণিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে এই প্রতিবাদী ভাবনাকে গ্রহণ করে আজকের প্রজন্মের দুরাচারীদের কটাক্ষ করে এই গল্পের বিষয় রচনা করেছেন। কৌতুক কাহিনি হলেও "এর মধ্যে একালীন গণ-আন্দোলনের নেতাদের কিঞ্চিত ঠেস্ দিয়ে তির্যকভাবে বিদ্রূপই করা হয়েছে।"[১০] তাঁরা মাতা, পিতা গুরুজন কারও সম্মান করে না, কোনও সুউপদেশ মানে না। স্থূলাকায় হয়েও তাঁদের বৃহৎ গোষ্ঠীর উপদ্রব ও আজকের যুগের এই উপদ্রবকারীদের ভয়ানক পরিনতি এখানে দ্রষ্টব্য। প্রতিনিয়ত মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা দুরাচারীদের প্রতি কষাঘাত করে লেখক পুরাণকে নতুন রূপে এই গল্পে সাজিয়েছেন। আলোচ্য পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক স্বার্থান্বেষী দুরাচারীদের অধর্ম থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষ যাতে পৌরাণিক ভাবধারাকে একেবারে বিস্মৃত না হয় এবং পাপ কাজ থেকে পুন্যের দিকে ফিরে আসতে পারে সেদিকেও লেখক নজর দিয়েছেন।

বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশ পুরাণে উল্লেখিত রৈবত-ককুদ্মী ও তাঁর কন্যা রেবতীর কাহিনি নিয়ে লেখক 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পটি রচনা করেছেন। পুরাণের কাহিনিটিকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে বিবাহ যোগ্য নারীদের সমস্যাকেই মূলত দেখিয়েছেন। বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য রাজা রৈবত পাঁচটি পাত্রের সন্ধান করে আনেন যাদের মধ্যে কাওকেই তাঁর মেয়ের পছন্দ হয় না ফলে তিনি নারদের উপদেশ মতো ব্রহ্মার কাছে গিয়ে মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্রের আবেদন জানান। কিন্তু তিনি যখন ব্রহ্মকুলে যান তখন সেখানে নাচ-গান চলছিল ফলে সওয়া দণ্ড তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে মর্ত্যের ১৮কোটি বৎসর গত হওয়ায় নরলোকে প্রকৃতি থেকে শুরু করে মানুষ সকলের পরিবর্তন হয়ে যায়। চিন্তিত রাজা এরপর ব্রহ্মার নির্দেশ মত দ্বারকাপুরীতে পরমেশ্বর বিষ্ণুর অবতার যাদববংশে নরলীলায় রত বলদেবের সঙ্গে বিয়ে দেন। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বহুকোটি বৎসর আগে জন্মানোয় রেবতী বিরাট ১৯ হাত লম্বা দেহাকৃতির মানবী, আর দ্বাপরের অন্তিম দশা শেষ হয়ে কলির প্রবেশে বলদেব ৪ হাত লম্বা মানুষ। এই বিসাদৃশ্য দম্পতির মিলনের অসুবিধার কথা ভেবে বলরাম তাঁর লাঙল দিয়ে রেবতীর গ্রীবা টেনে ৩ হাতের করে দিলেন, কিন্তু সেটাও বেমানান ছিল। এর উপায় স্বরূপ রেবতীকে তিনি গাছের ডালে ঝুলিয়ে পা ধরে টেনে তাঁর থেকে ৭ আঙুল ছোট করে তাঁর সুসমঞ্জস করে তুললেন। গল্পটির মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন যে প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে চলে, সঠিক সময়ে যদি সঠিক কাজ না করা হয় তাহলে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হয়। এরপর যতই আমরা তাকে ঠিকঠাক করার চেষ্টা করি না কেন তা আর আগের মত স্বাভাবিক হয় না। তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করে, কিন্তু ভুলে যায় যে অর্থ, গর্ব, অহঙ্কার, প্রতিপত্তি কিছুই শাশ্বত নয়। পৌরাণিক এই কাহিনিকে লেখক আধুনিক মনোভাবনায় সাজিয়ে জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া বিবাহ যোগ্য কন্যাদের নিয়ে চিরকালীন পিতাদের যে চিন্তা, বিয়ের পর মেয়েদের নিজেদের খাপ খাওয়াতে কতটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, বাস্তব এসমস্ত সমস্যাগুলোকে তিনি পৌরাণিক আদলে সাজিয়ে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত এই সুউপদেশ দিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লেখক এই পৌরাণিক আখ্যানটির নব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মিথের সঙ্গে কখনো কাহিনি জুড়ে কখনো বর্জন করে লেখক আধুনিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গল্পের প্লটটিকে মানানসই করে তুলেছেন।

'ছান্দোগ্য উপনিষদে' রয়েছে মহর্ষি সত্যকাম তাঁর গুরু গৌতম কতৃক 'জাবালি' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য গল্পে রামায়ণে উল্লেখিত জাবালি চরিত্রকে এনে নতুন ভাবে দেখানো হয়েছে। ভরতের সঙ্গে বশিষ্টাদি যে সকল ঋষিগণ পর্বতে গিয়েছিলেন তাঁরা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যায়নের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রইলেন বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যে গদ্যানুবাদ করেছিলেন তা থেকে পরশুরাম এই গল্পের সূচনা অংশ নির্মাণ করেছেন।[১১] তিনি রামচন্দ্রকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে জীবনের সুখ সম্পদ বৈভব, রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে এভাবে পিতৃসত্য পালন করতে বনবাসীর জীবন গ্রহণ করা মূর্খতার নামান্তর। এখানে লেখক জাবালির মাধ্যমে আধুনিক বাস্তব মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরাণ শাস্ত্র অনুসারে যেখানে পিতার আজ্ঞা পালনই হচ্ছে পুত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য সেখানে জাবালির মত একজন ঋষি সেই পৌরাণিক নিয়মকে একেবারে অমূলক বলেছেন। চিত্রকূট পর্বতে রামের সঙ্গে ক্ষণিক কথোপকথনে জাবালির যে সংস্কারমুক্ত আধুনিক যুক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন, লেখক এই অংশটিকে নতুন রূপে আধুনিক সময়ের উপযোগী করে দেখাতে চেয়েছেন। স্বাবাভিক ভাবে পুরাণে বর্ণিত অধিকাংশ দেব দানব চরিত্র সংস্কারাছন্ন গতানুগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাবালি ঋষি হয়েও বাস্তববাদীর মতো রামচন্দ্রকে যে বোঝানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সেখানেই নূতনত্ব ফুটে উঠেছে। এই নূতনত্বের বৈচিত্র্য সাধনে লেখক জাবালিকে আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, সচেতন, নিছক সাংসারিক মানুষ রূপে নির্মাণ করেছেন।

ভীম মহাভারতের পাণ্ডবদের দ্বিতীয় ভ্রাতা, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। 'ভীম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুটি পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে এক কল্প কাহিনি হচ্ছে 'ভীমগীতা'।

> "দুই পৌরাণিক চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে জীবন ও জগতের সত্যান্বেষণের জন্য কিছু তাত্ত্বিক কথাই এখানে উপাস্থাপিত হয়েছে।"[১২]

ভীম ও কৃষ্ণের মধ্যে এখানে গীতা তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে পৌরাণিক সূত্র না থাকলেও বিতর্কে উভয়ের মতামত পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

> "কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মকেই গীতায় গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই এই গল্পে তিনি অক্রোধ ধর্মযুদ্ধকে সমর্থন করেন।"[১৩]

তাঁর মতে দুর্জন ব্যক্তির প্রতি যদি ক্রোধ বাড়িয়ে তোলা যায় তবে যুদ্ধের প্রতি তাঁর ইচ্ছা দ্বিগুন হয়ে যায়। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের রিপুগুলো ভীমের মধ্যে দেখা যায়। তাঁর মতে যেমন কাম ত্যাগ করে বংশ রক্ষা করা যায় না, একইরকম ভাবে ক্রোধ ত্যাগ করে আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করা যায় না। লেখক শেষে কৃষ্ণের গীতা তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে অহিংস ও সহিষ্ণু হয়েও যে যুদ্ধ করা যায় সেই দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ক্রোধবশত যে কোনও কাজের পরিণাম কষ্টকরই হয়। এই গল্পে লেখক রঙ্গব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে নয়, বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৌরাণিক অনুষঙ্গকে টেনে এনে নবরূপ দিয়েছেন।

নারীর প্রতি মোহ যে কোনও পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ যতই শাস্ত্রপাঠ, অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত থাকুক না কেন, পরমাসুন্দরী দেখলে যে তাঁর চিত্তচঞ্চল হয়ে উঠে পরশুরামের 'যযাতির জরা' গল্পে একথাই বর্ণনীয়। মহাভারতের কাহিনি কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে অনেকগুলো কল্পিত চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করে লেখক এই গল্পটিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতি তাঁর যৌবন কামনায় এতটাই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে নিজের জরা দিয়ে তাঁর যৌবন নিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর যৌবন ভোগ করে অবশেষে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, আকাঙ্খায় কোনও নিবৃত্তি নেই। তখন তিনি পুরুকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেবার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি রচনা করেছেন। মহাভারতে সময়ের ব্যবধানটি ছিল হাজার বছরের এই গল্পে পঁচিশ বছরের। বিষয়তৃষ্ণার প্রতি আসক্তিহীন হয়ে পিতার সঙ্গে নিজের বার্ধক্য পুনর্বিনিময় করতে প্রথমত পুরু রাজি না হলেও পরে মনোহারার মতো এক সুন্দরী কন্যার মোহকে পিতা ও পুত্র উভয়েই নিজ নিজ প্রতিশ্রুতির থেকে বিচলিত হয়ে পড়েন। এছাড়া যযাতি যখন পুণরায় বার্ধক্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন তখন তাঁর অল্পবয়স্কা পত্নীরা কিংবা রজকীয় ঘোষণার পর যেসব বৃদ্ধেরা তাঁদের বয়স কমাতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, তাঁদের পত্নীরা যে যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া একেবারে বাস্তব সমাজের স্বাভাবিক মানসিকতা প্রকাশ করে। বয়সের বিনিময় ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য হলেও বাকি ঘটনাগুলোর মাধ্যমে আজকের যুগের বাস্তবতাই লক্ষণীয়।

> "মহাভারতের পৌরাণিক বৃত্তান্তে ভোগ ও ত্যাগের যে আধ্যাত্মিক ব্যখ্যান নিহিত আছে বলে মনে করা হয়, পরশুরামের গল্পে সেই তত্ত্বকচায়নকেই সুকৌশল বিদ্রূপ করা হয়েছে। বাণপ্রস্থ - উন্মুখ পিতা এবং তপস্যাব্রতী পুত্র - উভয়ই যে তেমন-তেমন পরিস্থিতিতে পরমাসুন্দরী নারীকে দেখলে নিজেদের প্রতিজ্ঞা থেকে টলে যেতে পারেন – সেটাই যে স্বাভাবিক জৈবধর্ম – এই বাস্তব সত্যটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন পরশুরাম।"[১৪]

দাম্পত্য কলহ, নারীর মানভঞ্জন এবং নারীর অভিমান এই ব্যাপারগুলোকে মহাভারতের চরিত্রের মাধ্যমে নতুন ভাবার্পণ করে লেখক 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' গল্পটি রচনা করেন। কলহ ও কলহনিবৃত্তির জন্য উপভোগ্য এই বিবরণে জ্বলজ্জট নামে এক কল্পিত ঋষিকেও মুখ্য চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

> "পুরাণ-প্রথিত 'মহামহিম' চরিত্রগুলির আড়ালেও যে লুকিয়ে আছ নেহাৎ নিছক সাধারণ মানুষের যাবতীয় দোষগুণ, সেটাই প্রতীত এ গল্পে।"[১৫]

মহাভারতে আছে কৌরব সভায় পাশা খেলায় হেরে যাওয়ায় দ্রৌপদী নিজের লাঞ্ছনা ভুলতে না পেরে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে লেখক দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর সঙ্গে অভিমানের কাহিনি গড়ে তুলেছেন। জ্বলজ্জট ঋষি তাঁর স্ত্রী হত্যার মিথ্যা দায়ে পঞ্চপাণ্ডবকে অভিযোগ করেন এবং এর প্রতিশোধ নিতে তিনি পাঞ্চালীকে চেয়ে বসেন। পঞ্চপাণ্ডবের একজনও সেই কথায় সম্মত হলেন না বরং নিজেদের দাসত্ব স্বীকার করে পাঞ্চালীর সুরক্ষা চাইলেন। এতে নিজের স্বামীদের প্রতি তাঁর সম্মান বেড়ে গেল এবং কলহের অবসান ঘটল। অভিমানিনী নারীর মানভঞ্জনে হঠাৎ বাক্যবাণ প্রয়োগে কৌতুকের সঙ্গে পৌরাণিক আবহকে মিলিয়ে লেখক গল্পটিকে নতুন রূপ দিয়েছেন। স্ত্রী জাতি যে কোনো পন্য বস্তু নয়, তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে লেখক আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে এক সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। পুরাণ বিষয়কে এখানে খুব দক্ষতার সঙ্গে বিনির্মাণ করেছেন।

এই নিবন্ধে আমার নির্বাচিত শেষ গল্প হচ্ছে 'নির্মোক নৃত্য'। পৌরাণিক চরিত্র ইন্দ্র, উর্বশী এবং নারদের সঙ্গে তিনি কিছু কল্প পৌরাণিক চরিত্র যোগ করেছেন। মহামুনি কুতুকের মত একটি কাল্পনিক চরিত্র যোগ করে তিনি আজকের যুগের পশ্চিমি নৃত্যভঙ্গী 'স্ট্রিপটিজ' এর প্রতি কটাক্ষ করে নারীর সৌন্দর্য যে তাঁর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে, বাইরের আবরণে নয় সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। দেবলোককে নিজ সৌন্দর্যে মোহিত করে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী যখন মর্ত্যে যাওয়ার প্রত্যাশা করেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে মহামুনি কুতুক, পর্বত ও কদমকে অভিভূত করার শর্ত রাখেন। সেই শর্ত মতে উর্বশী পর্বত ও কদমকে নিজ নির্মোক নৃত্যে অভিভূত করলেও কুতুককে অভিভূত করতে ব্যর্থ হন। কুতুক তাঁর নগ্ন দেহের পর আরও নির্মোক ত্যাগ করতে বলেন যা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে টেনে এনে তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর নারীত্ব কোথায় "যার প্রভাবে আকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।"[১৬] শেষে সুন্দর দেহের পিছনে কঙ্কালসাড় কঠিন হাড়ের সঙ্গে একটি ছাগদেহের তুলনা করে চরমভাবে তার বিদ্রূপ করলেন।

> "সমস্ত আভরণ-আবরণ নির্মোচন করার পর অনাবৃতা উর্বশীর কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়লেও তাঁর নারীত্বের স্বরূপ সম্পর্কে কুতুক মহামুনি যে কৃতনিশ্চয় হতে পারলেন না – সেটাই মিথ ভাঙার প্রকৃত পরিণাম।"[১৭]

উর্বশীর মতো চরিত্রের আত্মঅহংকারের নির্মম পরিণতিকে দেখিয়ে লেখক এখানে কৌতুকের ছলে আধুনিক মানুষের মানসিকতা প্রকাশ করেছেন। পুরাণকে উপলক্ষ করে আধুনিক বাস্তব পৃথিবীর নগ্ন সত্যকে এখানে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুরাণকেন্দ্রিক এই গল্পগুলোতে একদিকে যেমন পৌরাণিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন একই ভাবে যুগোপযোগী নতুন চিন্তাধারার সংযোজন করেছেন। ফলে যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলোচ্য গল্পগুলোতে পৌরাণিক অনুষঙ্গ এনে খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে তার নব রূপায়ণ করা হয়েছে। নতুন চিন্তাধারায় প্রতিটি গল্পকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যেখানে মানুষ পৌরাণিক সাহিত্যকে একেবারে ভুলে চলছে সেখানে পরশুরামের গল্পে পুরাণকে দেখার নতুন প্রয়াস সত্যি অতুলনীয়।

> "পরিহাসজল্পিত ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ বা তির্যক বিদ্রুপের মাধ্যমে হিউমার ও স্যাটায়ারের বকযন্ত্রে জারিত করে পুরাণকথার এভাবে প্রতিবেদন তা আর কেউই করেননি।"[১৮]

'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্পে উপদ্রবকারীদের দুর্গতি, 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পে বিবাহ যোগ্যা নারীদের সমস্যা, 'জাবালি' গল্পে পরিস্থিতি বুঝে কর্তব্য পালন, 'ভীমগীতা'য় অক্রোধ ধর্মযুদ্ধের প্রতি সম্মতি, 'যযাতির জরা' গল্পে নারীর প্রতি জরার লালসা, 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী'তে নারীর অভিমান ও মানভঞ্জনে দাম্পত্য কলহের প্রকৃতরূপ এবং 'নির্মোক নৃত্য' গল্পে নারীর দেহ সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ আসলে কোথায়, আজকের জীবনে এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরে লেখক যেভাবে তার স্বরূপের সঙ্গে নবরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন সেটাই এই নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

Reference:

১. সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), 'পৌরাণিক অভিধান', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, একাদশ সংস্করণ জৈষ্ঠ্য, ১৪২২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০৭৭৩, পৃ. ২৯৭
২. দাস, অর্পিতা, 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কবিতায় পুরাণ অনুষঙ্গের নব রূপায়ন', দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৯
৩. রায়, অশোক, 'বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৯৬
৪. ঐ
৫. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৪
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, 'পরশুরামের গল্প : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১১, কার্ত্তিক ১৪১৮, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ১৫৪
৭. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৫
৮. সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), 'পৌরাণিক অভিধান', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, একাদশ সংস্করণ জৈষ্ঠ্য, ১৪২২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০৭৭৩, পৃ. ২৮৩
৯. তদেব, পৃ. ৩৩৩
১০. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ১৬৯
১১. মণ্ডল, সুধাংশু শেখর, 'পরশুরামের কজ্জলী – শরতের মেঘে বজ্র', প্রজ্ঞাবিকাশ, পুনর্মুদ্রন নভেম্বর, ২০১১, কলকাতা -৭০০০৯, পৃ. ৪৪
১২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ১৬৬
১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, 'পরশুরামের গল্প : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১১, কার্ত্তিক ১৪১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১৬২
১৪. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ১৬১
১৫. তদেব পৃ. ১৬৯
১৬. বসু, রাজশেখর, 'পরশুরাম গল্পসমগ্র', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, নতুন সংস্করণ আশ্বিন, ১৪১৭, অক্টোবর ২০১০, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, পৃ. ৬১৩
১৭. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, কলকাতা, পৃ. ১৫৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৮. তদেব পৃ. ১৬৯